কৃষ্ণমূর্তির ভাবনায় মনের দন্দ্ব ও ব্যক্তিত্ব গঠন

ডঃ জগদীশ দাস
গ্রাম- মাহিষা মসলন্দপুর; পোঃ- কুমড়া কাশিপুর; থানা- হাবড়া ; জেলা- উঃ ২৪ পরগনা

সারাংশ

বিষয় সম্পর্কে ভালো লাগা বা মন্দ লাগা আসে স্মৃতির হাত ধরে। পাওয়ার ইচ্ছা পূরণ না হলে আসে দুঃখ। সেজন্য দুঃখের কারণ এই চাওয়ার বা বলা যায় কোন বিষয়কে পাবার যে ইচ্ছা জাগে সেই ইচ্ছার জন্য স্মৃতিই দায়ী। কিন্তু তাকে তো বাদ দেওয়া যায় না। আসলে বিষয় সম্পর্কে আমাদের যখন প্রকৃত ধারণা থাকে তখনই আমরা বিষয়ের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করতে পারি। আর সেই বিষয়ে আমাদের করণীয়ও আমরা বুঝতে পারি। তাই সেই বিষয়ের প্রতি অন্যায্য আকর্ষণ আর থাকে না। বিষয় সম্পর্কে আমাদের আমাদের প্রকৃত ধারণা হওয়া থেকে যা বাধা দেয় কৃষ্ণমূর্তি তার নাম দিলেন দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যা আমাদের জ্ঞানলাভে বাঁধা দেয় এমনতর ভাবনা, চিন্তা, স্মৃতি বা চাওয়া। এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তির জন্য আমাদের সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেগুলিকে নিজের মধ্যে চিনতে পারলে তাদের নিরসনের জন্য চেষ্টা আসবে। আর তখন তার নিরসনে খুব বেশী সমস্যা হবে না। আর দ্বন্দ্বমুক্ত মন বহুগুণে সতেজ ও সক্রিয় হয়ে থাকে। এইরকম মন আমাদের জীবনের যাপনের ক্ষেত্রে ভীষণ সহায়ক হয়ে থাকে। বস্তু বিষয়ক সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। মন হয় সৃজনশীল। দ্বন্দ্বের মূল কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই দ্বন্দ্ব থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। বরং দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বন্দ্বকে কাছ থেকে চিনতে হবে। আর তার নিরসন করতে হবে। সাধারণতঃ আমরা প্রত্যেকেই দ্বন্দ্ব নিয়ে বেঁচে থাকি। দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকলেও আমরা তাতে এমন অভ্যস্ত যে আমরা বুঝতেই পারি না যে আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। ঠিক যেমন রোজ একই রাস্তায় চলতে চলতে রাস্তার পাশে থাকা আবর্জনা দেখে আমাদের মধ্যে আর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, তেমনি আমাদের মধ্যে থাকা দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত এতটাই থাকে যে সে সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবায় না। কিন্তু তাতে কোন সমস্যা ছিল না যদি না তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রভাব ফেলত। দেখা যায় যে দ্বন্দ্বের প্রভাব আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বেশ গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রধানতঃ দ্বন্দ্বের প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা কমে যায়। কুৎসিতকে আর তেমন কুৎসিত (নোংরা, আবর্জনা, অন্যায়, পাপ ইত্যাদি) মনে হয় না, আবার সুন্দর

(চাঁদ, ফুল, নদী কিম্বা কোন আত্মীয়দের) কেও আর তেমনভাবে সুন্দর মনে হয় না। এর ফলে বস্তু বিষয়ে আমাদের যথার্থ জ্ঞান হয় না। তাই দুঃখ আছে এটা বুঝতে পারি, কিন্তু নিরসনের উপায় না পেয়ে তা থেকে পালাতে চাই। আর তাতে দ্বন্দ্ব আসে ও সেইসাথে দুঃখ আসে। কৃষ্ণমূর্তি বলেন দুঃখ থেকে পলায়ন নয়, দুঃখকে অনুভব করতে হবে। দুঃখকেই নিজের স্বরূপ বলে অনুভব করতে হবে। তাহলে তা থেকে জীবনীয় রসদ সংগ্রহ করা যাবে। নিবন্ধটি মূলতঃ গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (qualitative method) অনুসরণ করে লেখা। এখানে মনোদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মনের দ্বন্দ্ব ও তার নিরসনের উপায় সম্পর্কে প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক শিক্ষক কৃষ্ণমূর্তির বক্তব্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নতুন করে নিজেকে মেলে ধরতে পারে উন্নততর ব্যক্তিত্বের মধ্যে।

মূল শব্দ: *মনের দ্বন্দ্ব, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব, সমস্যা, মনের দ্বন্দ্ব ও সতেজতা, প্রতিযোগিতা, উচ্চাকাঙ্খা, সৃজনশীলতা,*

ভূমিকা

কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তিনি প্রায় ষাট বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে তার ধর্ম বিষয়ক বক্তব্য মানুষের মধ্যে পরিবেষণ করেছেন। সেইসময় তাঁর সমমানের আধ্যাত্মিক প্রবক্তা খুব কমই ছিল। শুধু তাই নয় তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর চিন্তা, তাঁর বক্তব্য, তাঁর লেখা বহু মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছিল। এই পরিবর্তন ছিল মনের ভেতরের, বাইরের নয়। এই পরিবর্তন মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর স্পর্শে যাদের মধ্যে এই পরিবর্তন আসত তারা সমস্ত বিশ্বে তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা বুঝতে পারতেন। কৃষ্ণমূর্তি যেন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে জানার নিরন্তর প্রয়াস কখনও থেমে থাকেনি। তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আমাদের জীবনের এক জ্বলন্ত সমস্যা। আর সেই সমস্যার স্রষ্টা আমরা নিজেরাই। আমরা দেখতে পাই আমাদের ব্যক্তি জীবন কম বেশী অসম্পূর্ণতাযুক্ত। আমরা কেউ সম্পূর্ণতা নিয়ে জন্মায়নি। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য আমাদের প্রচেষ্টার অন্তঃ নেই। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানান্বেষণ ইত্যাদি সবই ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। তবু আমরা সেইরকমভাবে নিজেদের সাফল্য পাই না। কৃষ্ণমূর্তি এর কারণ ও এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কি সে বিষয়ে দিক নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন ভাবে। তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা যা লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল তার কয়েকটি সংগ্রহ করে সেগুলি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হল এই গবেষণা পত্রে। যদিও এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান ও গবেষণার দিক খোলা থাকে, আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য পরিসরও সীমিত রাখা হল।

স্মৃতি ও মনের দ্বন্দ্ব

সমস্যা ও তার সম্মুখীন হওয়াঃ-- মানুষ মাত্রই সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যা থাকাটা প্রায় প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি স্বাভাবিক ব্যপার। এই সমস্যা নানা প্রকারের হয়ে থাকে। বিষয়ের ব্যাপকতা ও জটিলতা অনুসারে সমস্যাকে গুরুতর বা লঘুতর হিসাবে আমরা দেখে থাকি। অনেক সমস্যা থাকে অনেক জটিল—যাদের সমাধানও আমাদের কাছে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়। সেগুলিকে আমরা বেশিরভাগ সময় এড়িয়ে যেতে চাই, তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই। বিনোদন, ধর্মকথার বাগবিলাশে অথবা অন্য কোন ব্যাপারের মাধ্যমে নিজের সমস্যাকে ভূলে থাকা যেন আমাদের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত সাধারণ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে সমস্যা এড়ানোর এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আসে নানা ধরণের দ্বন্দ্ব। এই সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরসনের জন্য চাই একটা নতুন ও মুক্ত মন।

মনের দ্বন্দ্ব ও সতেজতাঃ—যে মন যতখানি দ্বন্দ্বমুক্ত সেই মন ততখানি সতেজ। মনকে দ্বন্দ্বমুক্ত রাখা যথেষ্ট কঠিন কাজ। আমরা অধিকাংশ মানুষ নানা প্রকার দ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন। আমরা সেই দ্বন্দ্ব হয় জিইয়ে রাখি, অথবা তার হাত থেকে বাঁচতে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে থাকি। কেউ বিনোদনে মন ভাসাই, কেউ ধর্ম-কথায় ডুবে যাই, আর ধর্মীয় প্রবক্তাদের দ্বারা প্রবর্তিত নানা ক্রিয়া-কলাপে নিযুক্ত হয়ে নিজের সমস্যাগুলি পাস কাটাতে চাই। এই প্রবনতা মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন বিষয় আয়ত্ত করা মানুষের পক্ষে ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে পড়ে। মানুষের মন নিস্তেজ ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। যদিও বা মানসিক দ্বন্দ্বের এই ঘনমেঘের ফাটল দিয়ে কোন কোন সময়ে বিষয় সম্পর্কে ক্ষণিক যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায়, তথাপি স্বীকার করতে হয় যে সেটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা। কৃষ্ণমূর্তি বলেন—"There may be a few moments when, in spite of all this misery of conflict, there is a break in the clouds and one sees something very clearly, and a sense of quietness, of depth comes into being; but that is very rarely।"[i]

দ্বন্দ্বে করণীয়ঃ—দ্বন্দ্ব এড়াতে সর্বপ্রথম আমাদের প্রয়োজন একটি মুক্ত মন। মুক্ত মন নিয়ে যে কোন ধারণার অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে হবে। কোন ধারণার কেবল বাইরের অর্থ নিয়ে উপর উপর ভেসে ভেসে না চলে একটা অত্যন্ত উৎসাহী ও তীক্ষ্ণ মন যা কিনা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে—সেরকম মনের অধিকারি হতে হবে। কারণ এইরকম মনের পক্ষেই সম্ভব দ্বন্দ্ব না এড়িয়ে তার সমাধান বা নিরসন করা।

আমাদের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে যে, কোন শব্দকে কেবলমাত্র তাত্ত্বিক বা মৌখিকভাবে গ্রহণ না করে ঐ শব্দের সাথে আমাদের যে দ্বন্দ্ব তা আমরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করব এবং ঐ দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করব। একটি নির্দোষ দ্বন্দ্বহীন মন সদা কর্মময় হয়ে থাকে। অপরদিকে যে মনে

দ্বন্দ্ব থাকে সেই মন সদা সংঘর্ষে ভরা। কোন শব্দ শ্রবণের সময় কেবল তার আক্ষরিক অর্থকে অনুধাবন করলে যে অর্থ পাওয়া যায় তা অতি সাধারণ অর্থ। কিন্তু সম্পূর্ণ সংস্কারবিহীন মন নিয়ে দেখলে আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাব যে আমাদের প্রত্যেকের মনে অনেক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এই দ্বন্দ্বগুলি ধরা পড়লে বা আবিস্কার হলেই আমরা দ্বন্দ্ব থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হব।

দ্বন্দ্বের উৎসঃ—দ্বন্দ্বের উৎস নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন--

- **প্রতিযোগিতাঃ**--"We have accepted conflict from childhood. In our education, all the schools throughout the world are breeding grounds of conflict, and there is the constant struggle to compete with others who are much cleverer than we are."[ii] অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত একটা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কাল অতিবাহিত করে থাকি। আমাদের চেয়ে সুন্দর যে আমরা তার চেয়েও সুন্দর হতে গিয়ে আমরা তার অনুকরণ করি। আমাদের চেয়ে যারা বেশি বুদ্ধিমান আমরা তার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান হতে চাই। আমাদের চেয়ে বেশি সম্পদ যার আছে আমরা তার চেয়েও বেশী সম্পদের অধিকারী হতে চাই। এই প্রতিযোগিতার মোহে পড়েই বহির্জগতে যেমন মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সংঘর্ষ বাঁধে। এই সংঘর্ষ এড়াতে মানুষ তখন ডুব দেয় অন্তর্জগতে, সে হয় অন্তর্মুখী। কিন্তু অন্তর্জগতেও আছে সুখ, শান্তি, দেবতা, ঈশ্বর, প্রেম, স্বর্গ ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম দ্বন্দ্ব। বাইরের জগতের প্রতিফলন যেন আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই দেখতে পাই। যদিও এই দ্বন্দ্বের পারে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, অর্থাৎ দ্বন্দ্বের পারে যাওয়া যায় এমন মন্তব্য কেউ করতে পারেন, তথাপি বাস্তব হল এই যে আমাদের ভিতরে ও বাইরে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ভিতরে ও বাইরে থাকা এই দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে বর্বরতা, মানুষের মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নির্মমতা। বাইরের আন্দোলন হয়ত মানুষের বাহ্যিক জীবনকে সুখ ও সমৃদ্ধি এনে দেয়, কিন্তু যেখানেই সমৃদ্ধি সেখানেই আসে প্রতিযোগিতার টানাপোড়েন, আসে সংঘর্ষ, আসে বিবাদ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও সেরকম দেখা যায়। দেখা যায় যেখানে দ্বন্দ্ব যত বেশি সেখানে সক্রিয়তা তত বেশী। দেখা যায় অনেক সন্ত, অনেক সমাজ সেবক, অনেক বুদ্ধিজীবী, অনেক লেখকের মন দ্বন্দ্ব-প্রবণ।
- **উচ্চাকাঙ্খাঃ**—উচ্চাকাঙ্খা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম বেশী এসে থাকে। বিভিন্ন ব্যাপারে যা আমাদের কাছে অধরা তার প্রতি আমাদের একটি বিশেষ আকর্ষণ ক্রিয়া করে। এই আকর্ষণের কারণে আমরা সেটা পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠি। লক্ষ্যবস্তু পাওয়ার জন্য অনেক সময় আমাদের মন থেকে দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি কমে যায় বা থাকে না। তার বদলে আসে নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব। না পাওয়াকে পাওয়ার জন্য নানারকম ভ্রান্ত উপায় অবলম্বন করে থাকি আমরা। এইসব দ্বন্দ্ব অনেক সময় দুজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে আবার কখনও দুটি দেশের মধ্যেও বিস্তৃত হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব এড়াতে কেউ অতিরিক্ত

ঈশ্বরের নাম করেন, আবার কেউ বা অতিরিক্ত মদ্যপান করেন। এভাবে নানা অলৌকিক ও অলীক উপায় দ্বারা আমরা দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টা করে থাকি।

দ্বন্দ্ব এড়াতেঃ—এভাবে যে দ্বন্দ্ব এড়ানো যায় না, বরং আরও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় সেকথা আমরা জানি। মনের মধ্যে যত দ্বন্দ্ব বাড়ে মানুষের সক্রিয়তা তত বাড়ে। সেই সক্রিয়তা যেহেতু সবসময় আকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রাপ্তির সঠিক পথ অনুসরণ করে না, তাই তার দ্বারা আরও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। এভাবে আমরা ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের চক্রে আবদ্ধ হই। আমাদের মন এই দ্বন্দ্ব থেকে পালাতে চায়। বিভিন্ন সাধু-সন্তরা এই দ্বন্দ্ব থেকে পালাতে এগুলিকে দমন-পীড়নের কথা বলেন, আবার বিভিন্ন প্রকার নিয়মের নিগড়ে আমাদের জীবনধারাকে বেঁধে দেন। আবার কেউ কেউ এইসব দ্বন্দ্ব থেকে পালাতে রাজনৈতিক সংস্কার বা সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এছাড়াও আছে নানাপ্রকার আন্দোলন পরোপকার ইত্যাদি নানা রকম সময় কাটানোর প্রয়াস। কিন্তু এভাবে দ্বন্দ্বের উপর আবরণ পড়ে মাত্র সমাধান হয় না, "And our everlasting prayer is that we may cover it up - and the gods reply, unfortunately, because the escapes are there for the taking."[iii]

সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বঃ দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই যে পলায়ন এই পলায়নের ফল হিসাবে আমরা পাচ্ছি আরও সমস্যা, আরও বিকৃতি। ফলে আসে আরও দুঃখ—বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়তঃ। যে সম্পর্কগুলো শুরু হয় একটি সুন্দর সূচনা থেকে তা বিকৃতি লাভ করে। অপরের সম্পর্কে আমাদের মনকে করে তোলে বিষাক্ত। ফলে যেটা প্রথমে ভালবাসা ছিল সেটা পরিণত হয় ঘৃণায়। আমরা এই ভালোবাসার ঘৃণায় পরিণত হওয়াকে ঢেকে রাখতে চাই। আর তার জন্যই আমরা সমস্যা থেকে পলায়নের পথ বেছে নিতে বাধ্য হই

তীব্র ক্রিয়া ও সৃজনশীলতাঃ আমরা যখন জানতে পারি যে আমামদের মনে এইরকম একটি ভীষণাকার প্রবণতা আছে, তখন আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে আমাদের মন কি দ্বন্দ্বহীনভাবে থাকতে পারে? আমাদের মন সদা সৃজনশীল। সে সবসময় নতুন কিছু সৃষ্টিতে নিযুক্ত থাকতে চায়। সৃজনশীলতা বলতে কেবল ভাস্কর, শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ারদের বিশেষ গুণসমূহকেই শুধু বোঝায় না, কারণ প্রকৃতির উপাদান থেকে মনের সাহায্যে সে নতুন কিছু তৈরি করলেও তার মনে থাকে অসংখ্য দ্বন্দ্ব। জগতের নানা ব্যপারে তারা দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল। তারা তখনও পরিচালিত হন—ঘৃণা, আক্রোশ, ক্রোধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা। ঈশ্বর বা যাই বলি না কেন তাঁকে পেতে হলে আমাদের মনকে হতে হবে দ্বন্দ্বমুক্ত। আর মনকে দ্বন্দ্বমুক্ত রাখার জন্য চায় তীব্র কর্ম। হয়ত আমরা সেই কর্মের অনেক খানি অনেকে করে থাকি। আবার হয়ত আমরা অনেকেই তা করি না।

অনেক প্রাচীন গুহাচিত্রে দেখা যায় যে মানুষ পশুর সঙ্গে লড়াই করছে, অর্থাৎ সংগ্রাম, যুদ্ধ বা লড়াইয়ের কারণ যে দ্বন্দ্ব তা সেই প্রাচীন কাল থেকেই আছে। অর্থাৎ দ্বন্দ্বমুক্ত মানুষ প্রায় সবসময়ই

বিরল।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আমাদের মন প্রতিনিয়ত কোন না কোন কর্মে রত থাকে। আমাদের মনের অবস্থার প্রতিক্রিয়া এই কর্মসমূহ। সুতরাং আমাদের এমনভাবে কর্মের সম্পাদন করতে হবে যাতে কিনা তা দ্বন্দ্বমুক্ত।

এরকম কর্মের সাক্ষাৎ যে আমরা পাই না তা নয়, এরকম কর্ম আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে আসে, আবার চলেও যায়। মস্তিস্কে রেখে যায় কিছু আনন্দের অনুভুতির ছাপ। এবং সেই কারণে আমরা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা করি। এই আকাঙ্ক্ষা আবার দ্বন্দ্বের সূচনা করে। আমাদের এই চাওয়াগুলি আসে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে। অতীতে যা আমাদের ভালো লাগে তাই আমাদের আবার পেতে ইচ্ছা করে। তাই আমরা কোন একটি দোকানে বার বার যাই, কোন একটি মানুষের সঙ্গ বা সান্নিধ্য বার বার পেতে চাই, একই অভিনেতার অভিনয় বার বার দেখি। এমনকি আমরা যে ঈশ্বরকে পেতে চাই এই চাওয়াটাও অন্যান্য চাওয়ার মতো আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটায়। শুধু চাওয়া নয় চাওয়াতে যা প্রতিবন্ধকতা আনে সেই প্রতিবন্ধকতাও আমাদের মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব এনে থাকে।

শিল্পিরা তাদের শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে যে সৌন্দর্য প্রকাশের আনন্দ অনুভব করেন, তাও অত্যন্ত ক্ষণিক। তারা সেই অনুভূতিকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করেন। আর তাতে ব্যর্থতা প্রায়ই এসে থাকে। এই ব্যর্থতার ফলস্বরূপ তাঁরা মদ্যপানসহ আরও নানাপ্রকার কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত হন। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁরা বিগত আনন্দ অনুভুতিকে ধরে রাখতে চান। অতীতে যা আমাদের আনন্দ দিয়েছে তা আমরা পেতে ইচ্ছা করি আবার এই ইচ্ছার একটা প্রতিরোধও থাকে। কিন্তু ইচ্ছাকে তো মুছে ফেলা যায় না। যদিও ধর্মীয় অনুশাসনের দোহায় দিয়ে অনেক সাধু সন্ত এইরকমই উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁরা মন থেকে সমস্ত কামনা বাসনা মুছে ফেলার কথা বলেন।

ইচ্ছা বা কামনা থাকাটা কোন সমস্যা নয়, তা থাকবেই। কিন্তু তার সমাধান থাকা চাই আমাদের কাছে। আর সমাধান তখনই সম্ভব যখন আমাদের কাছে সমস্যাটির প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে। ঠিক যেমন একজন মোটর মেকানিকের কাছে মোটর গাড়ির সমস্যা আদৌ কোন সমস্যা নয়। কারণ সে জানে মোটর গাড়ির কোন সমস্যা হলে কোথায় কি করণীয়। আমরা প্রায়ই আমাদের সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ জানি না, তাই আমরা সবসময় বুঝতে পারি না যে কোথায় কি করতে হয়, তাই তা থেকে আমরা পালিয়ে থাকি কিম্বা তা আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, আমাদের সংগ্রামে রত করে। কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন—সন্তরা যদি আমাদের সমস্যার সমাধান না দিয়ে কেবল তাকে এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দেন তাহলে তা হবে একপ্রকার হঠকারিতা, তাঁর ভাষায়—"Here we do not know what to do, and the not-knowing is a problem. We cannot destroy desire, that would be too appalling, too stupid; it would be the vulgarity of the saint - sorry if I shock you. And resistance is a form of suppression. Right?"[iv]।

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের মনের ইচ্ছাকে জানি। আমারা কি চাই আর কিসেই বা তাতে বাধা দেয় তাও আমরা জানি। সাধারণতঃ আমাদের সামাজিক মান ও মর্যাদা, পারিবারিক ঐতিহ্য, পরিবেশ থেকে

পাওয়া ঠিক-ভুলের মানদণ্ড ইত্যাদি আমাদের মনের চাওয়া থেকে আমাদের কর্মকে বেঁধে রাখে।

সমস্যা ও তার উৎসঃ

আমরা দেখলাম যে চাওয়া আসে অতীত অভিজ্ঞতা বা স্মৃতি থেকে। কিন্তু স্মৃতিকে তো জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না। স্মৃতি আমাদের জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান। আমাদের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা আমাদের মনে একটি ছাপ রেখে চলে যায়। এই ছাপকে বলে স্মৃতি। এই স্মৃতি থেকেই আসে নানারকম চাহিদা। এখানে একটা দ্বন্দ্ব এই যে আমাদের একদিকে স্মৃতি ছাড়া চলে না, অপরদিকে স্মৃতি থেকে উদ্‌ভুত চাহিদাজনিত সমস্যা থেকে আমরা যেন পালিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু যদি আমরা স্মৃতি থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে তাকে কাজে লাগাই তাহলে আমাদের এই স্মৃতিকে আর আমাদের মাথার ভার হিসাবে বহন করতে হয় না, আমরা হাল্কা হতে পারি। কিন্তু বাস্তবে আমরা সাধারণতঃ তা করি না। আমরা আমাদের পুরানো অভিজ্ঞতাকে আরও ভারাক্রান্ত করে তুলি নতুন অভিজ্ঞতাকে তার সাথে জুড়ে দিয়ে। আমরা যা দেখি তা নিজের ধারণা অনুসারে আংশিক রূপে দেখি। সম্পূর্ণরূপে দেখতে পাই না। বিষয়কে সামগ্রিকরূপে দেখলে তবেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের সঠিক অভিজ্ঞতা হয়। এই আংশিক অভিজ্ঞতা পুরানো অভিজ্ঞতার সাথে জুড়ে তাকে আরও জটিল করে তুলি।

সুতরাং প্রশ্ন হল যে এই অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্তরূপে কি মনকে আমরা পেতে পারি? মন অভিজ্ঞতা ছাড়া থাকতে পারে না, পারলেও তা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু পুরানো অভিজ্ঞতা যে নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে এটা নিশ্চিত। তাই এই অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত একটি মন আমরা কীভাবে পেতে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এরকম অভিজ্ঞতা পেতে হলে সর্ব প্রথম আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার উপর অত্যন্ত আগ্রহী হতে হবে বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। আমার বর্তমান অভিজ্ঞতার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে। আমাকে খুঁজতে হবে ঠিকভাবে আর খোঁজা যদি ঠিক হয় তাহলে সেই অনুসারে বিষয় প্রাপ্তিও সহজ হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন বাদ্যযন্ত্রের সঠিক স্থানে আঘাতের ফলে সঠিক শব্দটি পাওয়া যায়, এখানেও তাই। আমরা আমাদের মনকে সহস্র দিকে ধাবিত করি প্রতিনিয়ত, তাই কোন বিষয়কেই সঠিকভাবে পাই না। মনকে সম্পূর্ণতঃ কোন একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করলে তবেই সেই মন দ্বন্দ্বমুক্ত হবে, সে আর পলায়ন-প্রবণ হবে না। কোন ইচ্ছা যদি থাকে আর তা যদি মঙ্গলদায়ক হয় আর তা যদি আমি পরিপালন করতে না পারি তাহলে সে বিষয়ে তখনও কোন সংশয় বা দ্বন্দ্ব আছে মনে করতে হবে। আর তখন মনকে আবার বিশ্লেষণ করতে হবে।

ব্যক্তিত্বে দ্বন্দ্বের প্রভাব ও তা থেকে মুক্তির উপায়

দ্বন্দ্ব, সমস্যা এবং ভয় নিয়ে আলোচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলো আমাদের মস্তিষ্কে আঘাত

হানে। মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ও ক্রিয়া ক্ষমতা নষ্ট করে। বিভিন্ন প্রকার কু-সংস্কার, বিধি-বিধান ইত্যাদি সবই মস্তিষ্কের সক্রিয়তা নষ্ট করে। তাই এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

মস্তিষ্ক ও দ্বন্দ্বঃ মস্তিষ্ক আমাদের পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ ও তাতে সাড়া দেবার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। যদি কেউ মস্তিষ্কের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে দেখা যাবে যে চিন্তার প্রত্যেকটি তরঙ্গ, অনুভূতি, স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সব মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক। আমাদের দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ, পরিস্থিতির পরিবর্তনের আসা ইত্যাদি সব মস্তিষ্কেই সম্পন্ন হয়। আমাদের মস্তিষ্ক নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে কিন্তু তার ক্রিয়াসমূহ ব্যাহত হয় দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, ভয় হতাসার মত মানসিক অবস্থা। আমাদের মধ্যে যেমন সুখের ভাব থাকে তেমনি দুঃখের ভাবও থাকে। আমাদের সত্তা চৈতন্যময় কিন্তু সেই চৈতন্যময় সত্তার উপর আঘাত হানে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব-জনিত বিভিন্ন মানসিক অবস্থাগুলি।

প্রকৃত শ্রবণ ও দ্বন্দ্বঃ আমাদের যখন কোন শব্দ শুনি সেই শব্দের কেবল আক্ষরিক অর্থ মাত্র যে বুঝলেই হয় না, কিম্বা কেবল পূর্ববর্তী ধারণার সাথে তার তুলনামাত্র করলেই চলে না। শ্রবণের সাথে কল্পনা মিশে যেতে পারে তেমন সম্ভাবনাও দেখা যায়। আবার কেবলমাত্র শব্দের অনুবাদেই আমাদের শ্রবণ সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত শ্রবণ হল তাই—যে শ্রবণের সাথে যুক্ত থাকে শব্দের তাৎপর্য্য। কল্পনা বা মনে থাকা নানা দ্বন্দ্ব আমাদের শব্দের প্রকৃত অর্থ থেকে দূরে রাখে। যেমন—কোন শিল্পীর কোন গান শোনার সময় যদি কেউ গানটিকে পূর্ববর্তী কোন গানের সাথে তুলনা মাত্র করে তাহলে সেই শ্রবণকে প্রকৃত শ্রবণের পর্যায়ে ফেলা যায় না। অর্থাৎ শ্রবণের ক্ষেত্রে প্রকৃত শ্রবণ ও নিছক শ্রবণের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। দেখা যায় যে ঐতিহাসিক যুগ থেকে আমরা এইরকম দ্বন্দ্ব নিয়ে বেঁচে আছি। দ্বন্দ্ব নিয়ে চলতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কেন আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আদি কাল থেকে জুড়ে থাকে? এর উত্তরে বলা যায় প্রতিযোগিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পরের অনুকরণের চেষ্টা ও তাতে ব্যর্থতা। এর ফলে আসে ক্রম-বর্ধমান চাপ। চাপ যখনই আসে পলায়ন বা নিজেকে অন্য কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা দেখা যায়। নানা রকম সমাজ সেবা, পরোপকার ইত্যাদি যা তাদের আদৌ মনের প্রকৃত ইচ্ছা নয় তাই নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে দেখা যায়। এসব প্রচেষ্টা আরও দ্বন্দ্বের আমদানি করে থাকে।

দ্বন্দ্বমুক্ত মনের প্রকৃতিঃ—সমস্ত দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মনকে মুক্ত রাখার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দ্বন্দ্ব থাকে। এই দ্বন্দ্ব থেকে আসে স্বার্থপরতা, স্বার্থপরতা থেকে আসে শত্রুতা। এইরকম স্বার্থপর মন থেকেই আরও নানা প্রকারের দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। অপরদিকে যদি কোন মন সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বমুক্ত থাকতে পারে তাহলে সেই মন ও মস্তিষ্ক হয় অত্যন্ত সক্রিয় ও বিচারশীল—এই মস্তিষ্ক হয় অত্যন্ত সক্রিয় কারণ এরকম হলেই মন সম্পূর্ণ ভাবে ক্রিয়া করতে পারে।

বাস্তব ও বাস্তবের ধারণাঃ—কিন্তু প্রশ্ন হল মন কি সম্পূর্ণ দ্বন্দ্বমুক্ত থাকতে পারে? বর্তমান যুগে দাড়িয়ে হয়ত অনেকেই এইরকম দ্বন্দ্বমুক্ত মনের সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। মনে করা হয় আক্রমণাত্মক না হলে ব্যবসায় উন্নতি হয় না। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় আক্রমণাত্মক হতে, বলা হয় আমরা যেন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হই। প্রতিযোগিতা ছাড়া যে উন্নতি আসতে পারে তা যেন আমরা ভাবতেই পারি না। বাস্তব পরিস্থিতিও অনেকটা সেইরকম। আমরা যা কিছু জানি সেই জানার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাস্তব ঘটনাকে পাই না, যা পাই তা হল ঐ বাস্তব ঘটনার সম্পর্কে একটি ধারণা। বাস্তব ঘটনার সম্পর্কে যে ধারণা অনেক সময় সেই ধারণাকেই আমরা বাস্তব ঘটনা বলে মনে করি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা ও বাস্তব ঘটনার ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে।

দ্বন্দ্বমুক্ত মনের সম্ভাবনাঃ নানা প্রকার ধারণা বা বিশ্বাস এসে আমাদের মনে নানারকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। দেখা যায় বেশিরভাগ দ্বন্দ্ব আসে আত্মস্বার্থের জন্য। প্রশ্ন উঠতে পারে আধুনিক যুগে আত্মস্বার্থ ছাড়া কি বাঁচা সম্ভব? কৃষ্ণমূর্তি বলবেন যে প্রথমেই যদি পারা না পারা নিয়ে মনে সংশয় থাকে তাহলে আর পারা হয়ে ওঠে না। তিনি আরও বলেন যদি পাহাড়ে ওঠার আগে কেউ মনে করেন যে তার দ্বারা পাহাড়ে ওঠা সম্ভব নয়, তাহলে দেখা যায় যে তার পক্ষে আর পাহাড়ে ওঠা সম্ভব হয় না। পাহাড়ে উঠতে গেলে চাই উৎসাহ, সঠিক তথ্য ও পরিকল্পনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টা। এগুলি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষেই কোন অনভ্যস্ত প্রক্রিয়ায় সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মস্বার্থ ছাড়া থাকা বা কোন কাজ করা আমাদের অভ্যাসে প্রায় নেই তাই তা আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হতেই পারে। আবার আত্মস্বার্থ মাত্রই যেহেতু আমাদের কর্ম মাত্রের প্রেরণা তাই সেইসব কর্ম আমাদের মস্তিষ্ককে বয়সের সাথে সাথে ক্রমশঃ ভোতা করে দিতে দিতে চলে। তাই দেখা যায় বয়স যত বাড়ে তত আমাদের নতুন কিছু করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। মন ক্রমশঃ অন্ধ বিশ্বাস বা কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন হতে থাকে। মন যে কোন মতবাদ যে কোন দর্শন বা প্রথা পালন করতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু যদি এমন মস্তিষ্ক যদি থাকা সম্ভব হত যে মস্তিষ্ক কখনও আঘাত পায়নি, অর্থাৎ যাতে কোন দ্বন্দ্ব আসেনি, এমন মস্তিষ্ক দ্বারা বিরাট কর্ম সম্ভব হয়, সেই বিরাট ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। তবে এটা একটা অনুশীলনের ব্যাপার। মনকে সবসময় আত্মস্বার্থরহিত ভাবে ক্রিয়া করতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের মস্তিষ্কের শক্তির বৃদ্ধি অমোঘ হয়ে ওঠে। তবে এই হয়ে ওঠার কোন শেষ নেই। মানুষের মধ্যে নিজের মনের এই দ্বন্দ্বমুক্তির প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা অনন্ত। এটা শুনে যদিও মনে হতে পারে যে এই ঘটনার দ্বারা আবার নতুন কোন মতবাদের আমদানি হচ্ছে, তাহলে সেই ধারণা ভুল। যদি বিষয়টিকে পারব ভেবে করতে শুরু করা যায় তাহলে তা পারা অসম্ভব নয়। যে এমন নিঃস্বার্থভাবে নিজের জীবন চালনায় নিজেকে অভ্যস্ত করবে সেই দ্বন্দ্বমুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে এবং তারই জীবনে অসীম সম্ভাবনা থাকবে উন্নত হয়ে উঠবার।

দ্বন্দ্বমুক্ত মন ও সৌন্দর্য্যঃ সুন্দর বলতে কি বোঝায়? আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখে তাদের সুন্দর বলে থাকি—যেমন সুন্দর মুখ, সুন্দর গাছ, সুন্দর ফুল, সুন্দর পাখি ইত্যাদি আমরা বলে থাকি। আবার আমরা সাধারণভাবে অনেক সময় তারকা ব্যক্তিদের সুন্দর বলে থাকি, কিন্তু সেই তারকা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। শুধু তাই নয় তিনি তাদের তারকা বলে স্বীকারও করতে রাজী নন। তাঁর মতে যারা প্রকৃতই সুন্দর, প্রকৃত তারকা তাদেরই নিজস্ব আলো আছে। তাঁরা নিজ মহিমায় নিজ গুণে আলোকিত থাকে। অর্থাৎ যার মধ্যে প্রকৃতই সুন্দর হওয়ার উপাদান থাকে তার কথায় আসা যাক। আমরা কি একটি গাছ, একটি ফুল, একটি চাঁদ, একটি মেঘমুক্ত আকাশ দেখে সৌন্দর্য্য খুঁজে পেতে পারি? দেখা যায় যে আমাদের দ্বন্দ্ব-বিধ্বস্ত মন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখতেই ভুলে গেছি। তাই তো আমরা গাছ কেটে ফেলি, সবুজ প্রকৃতিকে মরুভূমিতে পরিণত করি। কারণ আমাদের তেমন করে আর গাছপালাযুক্ত এই সুন্দর জগৎকে সুন্দর লাগে না বলেই কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে 'সুন্দর' কি নিছক একটি শব্দ? তা কি কেবল বইয়ের পাতায় থাকা কোন অর্থবিহীন কোন শব্দ—এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

তিনি অনুসন্ধান করে দেখতে চেয়েছেন যে কেন আমাদের মধ্য থেকে ক্রমশঃ সুন্দরের ধারণা চলে যাচ্ছে? তিনি অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের যে সৌন্দর্য্য তাকে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন এইসব কৃত্রিম সৌন্দর্য্য আসলে শূন্যগর্ভ। আসলে মানুষ কোন না কোন বিষয়ে নিমগ্ন থাকে। কেউ পূজায়, কেউ দেশ সেবায়, কেউ সমাজ সেবায় নিজেকে নিমগ্ন রাখে। নিমগ্ন হওয়া মানে নিজের সমস্ত শক্তি কোন বাহ্য বিষয়ে নিয়োজিত করা বা নিজের মধ্যে থাকা কোন বিষয়ে যেমন—কোন মতবাদ বা কোন আদর্শে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা। কোন শিশু যখন দুষ্টুমি করে তখন তার হাতে একটা খেলনা দিলে যেমন সে শান্ত হয়ে যায় তেমনি কোন পরিণত মানুষকেও নানা রকম খেলনা নিয়ে এরকম শান্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। যেমন, কেউ ঈশ্বর নামক খেলনা, কেউ মন্ত্র নামক কেলনা, কেউ বা অন্য কোন খেলনা নিয়ে নিজেদের নিমজ্জিত রাখে এবং বাস্তব জগৎ ভুলে থাকে। যতক্ষণ আমাদের হাতে ঐ সব খেলনা থাকে তখন আমরা অন্য সব ভুলে থাকি একদম শান্ত হয়ে যাই।

সুন্দরের প্রতি সংবেদনশীলতাঃ আমরা কোন সুন্দর বস্তু যখন দেখি তখন দেখা যায় ঐ বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে আমরা অভিভূত। যেমন—যদি কেউ কোন পর্বত দেখে তাহলে সেই পর্বতের বিশাল আকার তার ব্যপ্তি, তার আকাশভেদী উচ্চতা দেখে আমরা মোহিত হয়ে পড়ি। এইরকম অভিভূতি আমাদের সুন্দরের প্রকৃত স্বরূপ জানতে দেয় না। তাই আমাদের এই অভিভূতি থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ আমাদের এই প্রবৃত্তি অভিভূতি আমাদের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেয়। এই সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা রাস্তার পাসের আবর্জনাতেও একসময় আর বিরক্তি বোধ করি না। সেই অবস্থাতে আমরা নিজেদের মানিয়ে নিই, অর্থাৎ তখন নোংরাকে আর নোংরা মনে হয় না। সংবেদনশীলতার অভাবে এইভাবেই আমরা কুৎসিত বা আবর্জনাব্রেষ্টিত হয়ে বেঁচে থাকি। আমাদের এই হারানো

সংবেদনশীলতা আমাদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তাই একে পুণরায় ফিরে পেতে হলে আমাদের অনুশীলন করতে হবে সংবেদনশীলতার। দেখতে হবে আকাশের ঐ চাঁদটিকে কিম্বা ঐ স্বচ্ছ জলে চাঁদের প্রতিচ্ছবি দেখে কি সুন্দর লাগে? যদি সুন্দর না লাগে তবে আমাদের সকল ধারণা ভুলে কেবল ঐ চাঁদের দিকে তাকাতে হবে। কোন রকম চিন্তা না করেই কেবল চাঁদের দিকে তাকাতে হবে। তাহলে একদিন ঐ হারানো সংবেদনশীলতা ফিরে আসবে। যা কিছু সুন্দর তাকে সুন্দর লাগবে।

আনন্দঃ—সুন্দরের পর এবার আমরা আলোচনা করব আনন্দ নিয়ে। আনন্দ বলতে কেবল যৌনতা উদ্‌ভূত আনন্দ নয় বরং আরও যেসব আনন্দ থাকতে পারে যেমন—জয়লাভের আনন্দ, আধিপত্য লাভের আনন্দ (অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর উপর আধিপত্য করেন আবার অনেক সময় স্ত্রী স্বামীর উপরও করে থাকেন)। আবার ধনী হবার আনন্দ, বিজয়লাভ করার আনন্দ, একটি সুন্দর বাড়ি থাকার আনন্দ, একটি সুন্দর বাগান থাকার আনন্দ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে আনন্দের সাথে শাস্তি ও পুরষ্কারের সম্বন্ধ আছে। এইসব আনন্দের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বর বিষয়ক নানা মতবাদ থাকলেও সেটাতেই সীমায়িত না করে অসীমতার তার জন্য একটি দরজা খুলে রাখা উচিৎ। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে কোন মতবাদই যেন দাবি না করেন যে সব কথা বলা হয়ে গেল। দুঃখ আমাদের সবারই ছিল আছে এবং থাকবে, কিন্তু তবু আনন্দের এই পরম স্বরূপ যে অনন্ত ঈশ্বর সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মীয় আচরণ ঈশ্বর প্রণিধানের অন্তর্গত। ধর্মীয় আচরণ বলতে আমরা কেবল বাইরের ক্রিয়াকলাপ গুলিকেই ধরে থাকি। যেমন—মন্দিরে যাওয়া প্রার্থনা করা ইত্যাদি আচরণ দেখেই আমরা ধারণা করি যে তিনি ধার্মিক। আবার যেসব ধর্মীয় উপদেশগুলি দেওয়া হয় সেগুলির অনেকগুলি আবার ধ্বংসাত্মক। যেমন—প্রবৃত্তিগুলি সম্মুখে এলেই তাদের দমনের কথা বলা হয়। ইন্দ্রিয় দমনের সাথে সাথে আমাদের মস্তিষ্কও ভোতা হতে থাকে। আর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সংবেদনশীলতাও নষ্ট হয়ে যায়। তাই আমরা আমাদের এইরকম ইন্দ্রিয় অনুভবের অভাবে অভ্যস্ত হয়ে চলি। এইরকম চলনকেই স্বাভাবিক মনে করি। ঠিক যেমন যে বাড়িতে নিত্য কলহ হয় সেই বাড়ির প্রতিবেশীরা ঐ কলহের কোলাহলকে পৃথকভাবে বোধ করতে পারে না। এখন প্রশ্ন হল—আমরা কি আমাদের সবকটি ইন্দ্রিয়কে একসাথে সজাগ রাখতে পারি? যখন দেখা যায় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সবগুলি একসাথে সজাগ থাকে তখন আমাদের আমিত্ববোধ থাকে না। আমরা আমাদের এইরকম অবস্থায় সাধারণতঃ থাকি না তাই এই অবস্থাকে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। যেহেতু আমরা আমাদের সবগুলি ইন্দ্রিয়কে একসাথে সজাগ রাখতে পারি না, এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় ভোতা থাকে তাই আমাদের আমিত্ব বোধের উদয় হয়। আমিত্ববোধহীন সকল ইন্দ্রিয়ের সজাগ অবস্থায় উপনীত হওয়ার এই প্রচেষ্টা আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে করতে পারি তাহলে আমরা সকলেই আমাদের মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ সক্রিয় অবস্থায়

এইভাবে উপনীত হতে পারি বলে কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন।

আমাদের জীবনে আনন্দ ও বেদনা উভয়ই থাকে। যখন আমরা পুরস্কৃত হই তখন আনন্দ আসে আর যখন তিরস্কৃত হই তখন আসে বেদনা একে আমরা শাস্তিও বলি। যেমন আমাদের বাড়িতে কোন পসা কুকুর থাকলে আমরা তাকে অনুগত হতে শিক্ষা দিই। যদি সে অনুগত হয় তাহলে আমরা তাকে পুরস্কৃত করি। তাই কুকুরটিও ধীরে ধীরে অনুগত হতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আমাদের জীবনও আমরা অনেকটা পুরষ্কার ও শাস্তির মাপকাঠিতে মেপে চলি। কিন্তু যদি আমরা পুরষ্কার ও শাস্তির এই মান-নির্ধারক মাপকাঠির বাইরে যেতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের জীবন একটা অন্যরকম অর্থ বহন করছে। তখনই আমরা আনন্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারব।

দুঃখঃ—সুন্দর বলতে যেমন কোনরকম দুঃখ কষ্ট বা কুৎসিত ব্যাপার ছাড়া একটি জটিল ব্যাপারকে বোঝায়, দুঃখ বলতেও অনুরূপ একটি জটিল ব্যাপারকে বোঝানো হয়। দুঃখ নামক সমস্যাটি সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই আছে, তবে তার সমাধান পাওয়া যায়নি। দুঃখ নানা প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন—সন্তান না থাকার দুঃখ, ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার দুঃখ, ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখ, একাকিত্বের দুঃখ, ধনী হতে না পারার দুঃখ, খ্যাতিমান হতে না পারার দুঃখ, কোন কিছু সামলে নিতে গিয়েও সামলে নিতে না পারার দুঃখ এবং সর্বোপরি মৃত্যু দুঃখ। মৃত্যু শোক অনিবার্য। এই দুঃখ থেকে আমাদের কারও পরিত্রাণ নেই। আমরা হাজার ধর্মীয় অনুশাসন পালন করলেও এই মৃত্যুশোক আসবেই।

দুঃখের মূল কারণঃ—দুঃখের মধ্যে মূলতঃ দুই প্রকার ভাগ হতে পারে—নিজের দুঃখ এবং অপরের দুঃখ। আমরা প্রত্যেকেই নিজের দুঃখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকি, কিন্তু অপরের দুঃখকে দুঃখ বলে অনুভব করতে পারি না। আমরা দূরে সীমান্তে যুদ্ধরত সৈন্যের মৃত্যুতে ততখানি বিচলিত হই না যতখানি স্বজনহারাদের দুঃখে ভেঙ্গে পড়ি। প্রতিদিন কত মানুষ যুদ্ধে প্রাণ দেয়। কত আত্মীয় স্বজন তাদের প্রিয়জনদের হারায়। দুর্ঘটনায় কত মানুষের জীবনহানি বা অঙ্গহানি হয়। আমাদের কোন কিছুতেই বিচলিত করে না। কারণ আমাদের সমাজকে এভাবেই গড়ে তুলেছি যেখানে কেবলই স্বার্থান্ধতা। এই সিমাহীন স্বারথান্ধতা আমাদের এমনই সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে যে আমরা কেবল নিজেদের দুঃখ নিয়েই বিচলিত থাকি।

দুঃখের স্থায়িত্বঃ—আমাদের যে দুঃখ তা কি অনন্ত বা আসীম? তার কি কোন সীমা আছে। না কি তার কোন সীমা নেই? আমরা দুঃখ নিয়েই বেঁচে থাকি। স্ত্রী, পুত্র পরিজনেদের বিয়োগের ব্যাথা আমাদের ভীষণ ব্যাথা দেয়। কিন্তু এই দুঃখ কেবল আমাদের নিজেদের লোকেদের বেলাতেই প্রযোজ্য। অন্যের বেলায় আমরা এতখানি ব্যাথা পাই না। তবে নিজেদের লোকেদের বেলাতেও এই দুঃখ কিন্তু কোন না দিন হাল্কা হয়। দুঃখ আমরা চিরকাল বহন করি না। আমরা এই দুঃখের স্মৃতি ভূলে একসময় নিজের

কাজ করতে থাকি। কিন্তু এটাকে নিষ্ঠুরতা বলা যায় না। একটা দুঃখ আসে আবার চলে যায় পরে আবার আরেকটা দুঃখ আসে এটাই স্বাভাবিক।

দুঃখ নিরসনে আমার ভূমিকাঃ—সমাজের এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা আছে। কারণ, সমাজের গঠনে আমরা প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে থাকি। তাই আমাদের এর পরিবর্তনে যথেষ্ঠ ভূমিকা থাকে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমার একার পরিবর্তনে কি সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব? কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন এই কথা বলার অর্থ সে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না। কারণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, যে হিটলার কিম্বা তাঁর মতন নিষ্ঠুর নেতারা নিজেরাই জগতে বহু পরিবর্তন এনেছিল। তাতে বহু মানুষের প্রাণ গেলেও ঐ একক ব্যক্তিদের ইচ্ছাতেই তা সম্পন্ন হয়েছিল। আবার বুদ্ধের মত মানুষও পাওয়া যায় যারা তাদের ইচ্ছা দিয়ে জগতের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। সুতরাং দুঃখের নিরসনের জন্য সর্বপ্রথম আমার নিজের মধ্যে আগে পরিবর্তন আনতে হবে।

নিজের দুঃখের প্রতি নিজেই কি সমব্যাথীঃ—যদি প্রশ্ন করা হয় যে আপনি কি মনে করেন যে দুঃখের নিরসন সম্ভব? দেখা যাবে বেশিরভাগ লোক এই বিষয় নিয়ে তেমন চিন্তা ভাবনা করেননি। আবার যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যে আপনি আপনার নিজের দুঃখ নষ্ট করতে পারেন? দেখা যাবে যে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসা নেই। তবে যদি জিজ্ঞাসা করতে বলা হয় তবে দেখা যাবে যে অনেকেই নিজের দুঃখের ক্ষেত্রেই তাদের জিজ্ঞাসা সীমাবদ্ধ রাখে। এরা এদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নিজেদের। যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই আগ্রহ কি নিজের প্রতি নিজেরই সমবেদনার প্রকাশ? দেখা যাবে তারা হয়ত বলবেন হ্যাঁ, খানিকটা তাই। দেখা যায় যে দুঃখকে আমরা অনেকটা পুরনো আসবাবের মত আঁকড়ে রাখতে চাই। ঠিক যেমন অতি প্রাচীন কোন আসবাব ভেঙ্গে গেলে আমরা নিজেদের অনেকটা শূন্য বোধ করি, তেমনি বহুদিন একসাথে থাকতে থাকতে কোন মানুষে আমরা নিজেদের এরকমভাবে জড়িয়ে ফেলি। তখন তাদের চলে যাওয়ায় নিজেদের অত্যন্ত ফাঁকা মনে হয়। দুঃখটা নিজেও আমাদের কাছে এইরকম প্রিয় একটা বিষয়। আমরা বহুদিন এর সাথে একসাথে থাকতে থাকতে একসময় নিজেদের এর সাথে একাত্ম করে ভাবতে থাকি। তখন যেন আমাদের এই দুঃখকে বিদায় দিতে ইচ্ছা করে না।

আমিই দুঃখঃ—সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমরা দুঃখকে নিজের জীবনের অঙ্গ হিসাবে দেখি এবং আমরা কেউ এই দুঃখকে সহজে বিদায় জানাতে পারি না। যেমন ধরা যাক কোন বক্তা তার স্রোতাদের দ্বারা যদি সম্বর্ধিত হয়ে থাকেন তখন সেই স্রোতারা তাকে ছেড়ে চলে গেলে তার নিজেকে একাকি লাগে, নিজেকে অনেক খানি একা মনে হয়। অর্থাৎ ঐ বক্তা নিজেকে স্রোতাদের সাথে সংযুক্ত করে

নিজেকে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। আমরা যখন কোন কিছুর সাথে সংলগ্ন থাকি তখন আমাদের ঐ বস্তুর সাথে জড়িয়ে নিজের কথা ভাবতে দেখি। যেমন—কোন পৌরাণিক কাহিনী, কোন ধর্মীয় আদর্শ ইত্যাদির সাথে সংলগ্ন থাকতে থাকতে অনেকে নিজেদের অস্তিত্বের সাথে ঐ বিষয়গুলিকে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেন যেন নিজেদের মনে হয় যে নিজেরায় যেন ঐ বিষয়টির সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন। একইভাবে মানুষও দুঃখের সাথে থাকতে থাকতে একসময় নিজেরাই দুঃখস্বরূপ হয়ে পড়েন। তাই যদিও আমরা মনে করি 'আমি দুঃখ ভোগ করি', তথাপি জেনে রাখা ভালো যে 'আসলে আমি আর দুঃখ আলাদা কোন সত্তা নয়, আমিই দুঃখ।' একই ভাবে বলা যায় 'আমিই ক্রোধ', 'আমিই লোভ'। এইভাবে দেখা যায় প্রতিটি বৃত্তি-প্রবৃত্তি যখন আসে তখন আমরা সেই সময়ের জন্য যেন তাই হয়ে যাই। সুতরাং দুঃখ থেকে পলায়ন মানে নিজের থেকে পলায়ন। তাই আর পলায়ন নয় দুঃখের সাথেই সাক্ষাৎ হোক আমাদের প্রত্যেকের। এই অভ্যাসের ফলে আমরা আমাদের স্বরূপকে চিনতে পারব নিশ্চয়। আর সেই সাথে আমরা চিনতে পারব প্রকৃত বাস্তবতাকে।

দুঃখ থেকে পলায়ন নয়ঃ—দুঃখ থেকে পলায়ন না করে তাকে পর্যবেক্ষণ বা অনুভব করতে হবে, যাতে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানতে পারি, কারণ দুঃখ আসলেই সত্য। একইভাবে ক্রোধ, লোভ মোহ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এদের থেকে পলায়ন না করে যতই এদের দিকে চেয়ে থাকব ততই এদের উজ্জলতর বলে মনে হবে। দুঃখকে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে একটা passion আসবে। এখানে passion বলতে একটি একমুখী টান বা আসক্তির কথা বলা হয়েছে। এই passion থেকেই ভালোবাসার উদ্ভব হয়। এর থেকেই সৌন্দর্য্য বোধ আসে।

সিদ্ধান্তঃ—আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে অন্যতম ভূমিকা রাখে আমাদের স্মৃতি। এই স্মৃতি যেমন আমাদের আত্ম-পরিচয় বহন করে আবার সে ভারাক্রান্ত হলে আত্ম পরিচয় প্রকাশে প্রতিবন্ধকও হয়ে থাকে। দেখা যায় আমরা প্রায়ই স্মৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের তুলনায় বেশী করে তার দ্বারা প্রভাবিত হই। আর তার ফলে আমাদের বর্তমানে দেখা বিষয়গুলি ঝাপসা হয়ে পড়ে। তাদের প্রকৃত স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা দেখলাম কৃষ্ণমূর্তি কিভাবে দ্বন্দ্ব আমাদের মনে ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে আমাদের কর্মের ব্যপ্তিকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সংবেদনশীলতা ক্রমশঃ কমতে থাকে। আমরা এই দ্বন্দ্বের আমদানি নিজেরাই করে থাকি। যদিও পরিবেশ আমাদের দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল হওয়ার মত করেই গড়া তবুও কৃষ্ণমূর্তি মনে করেন সেখানেও আমার ভূমিকা আছে। কারণ আমারাই সমাজকে এইরকম করে গড়েছি। আমরা আত্মস্বার্থ ছাড়া কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। কেবল নিজেদের ব্যাপারগুলো নিয়েই আমরা সর্বদা ব্যস্ত থাকি। আমাদের এই আত্মস্বার্থের গণ্ডীর বাইরে বেরোতে হবে। আর তার জন্য আমাদের আমিত্বের সীমানার বাইরে বেরোতে হবে। তিনি মনে করেন আমিত্বের এই সীমার বাইরে বেরোতে গেলে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি একসাথে সজাগ

ও সক্রিয় রাখতে হবে। এইরকম অবস্থায় আমাদের আমিত্ব থাকে না। আর আমিত্ব না থাকলে আমাদের আত্মস্বার্থের গণ্ডীও থাকে না। যার ফলে আমাদের সমাজ আমাদের আর স্বার্থান্বেষী হওয়ার প্রেরণা জাগায় না—আমরা তাকে তেমনভাবেই তৈরি করি। আবার তার জন্য আগে আমাদের নিজেদের মধ্যেই পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের আগে দ্বন্দ্বমুক্ত সক্রিয় মন গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরই স্বার্থের গণ্ডী থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদের অনুশীলন করতে হবে নিজেদের দুঃখ, নিজেদের রাগ-দ্বেষাদি থেকে পলায়ন না করে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তার মুখোমুখি হতে হবে। দেখা যাবে যে আমাদের অস্তিত্বই এদের নিয়ে তাই এদের ভালো পর্যবেক্ষণ করে তাকেই আমার জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। "Do you know what passion is? No, you don't. Because without passion you cannot create anything, you cannot love without passion. Don't translate it into sexual passion, lust. Passion is important, without passion life becomes shallow, and therefore that which is shallow has no beauty, no love, and no passion."[v] তাই যেদিন থেকে আমরা আমাদের দুঃখ থেকে, আমাদের মনের বৃত্তি থেকে পলায়ন করা থেকে বিরত হয়ে তাকে কাজে লাগাতে আরম্ভ করব সেদিন আমাদের জীবনের মানেটাই বদলে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

---

[i] Public Talk 3 London, England - 07 May 1961
[ii] Public Talk 3 London, England - 07 May 1961
[iii] Public Talk 3 London, England - 07 May 1961
[iv] Public Talk 3 London, England - 07 May 1961
[v] Public Talk 3 Madras (Chennai), India – 05 January 1985.

তথ্যসূত্র

Public Talk

Krishnamurti, J. "Can the mind experience without leaving a residue as memory?" Public Talk 3 London, England - 07 May 1961.

Krishnamurti, J. "The Shallowness of a life without passion", Public Talk 3 Madras (Chennai), India – 05 January 1985.

Websites

Krishnamurti, J & Dr. David Bohm. "The Ending of Time", https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Ending-of-Time.pdf, 12-12-2024.

Krishnamurti, J. "The open Windows of Heart", Krishnamurti foundation trust, https://kfoundation.org/downloads/, 15-11-2024.

Krishnamurti, J. "The Future of Humanity, conversation with David Hume", https://selfdefinition.org/krishnamurti/Jiddu_Krishnamurt_The_Future_of_Humanity.pdf, 22-10-2024.

Krishnamurti, J. "Truth and actuality", https://www.holybooks.com/wp-content/uploads/Truth-and-Actuality-by-J-Krishanmurti.pdf, 15-09-2024.

Krishnamurti, J. "The Limits on thought", https://www.crisrieder.org/thejourney/storage/2025/06/The-Limits-of-Thought-Krishnamurti-and-David-Bohm.pdf, 12-08-2024.

Krishnamurti, J. "Wholeness of Life", Vedanta Spiritual Library | www.celextel.org, (May 1976), 08-07-2024.

Krishnamurti, J. "The Awakening of Life", https://content.e-bookshelf.de/media/reading/L-15499526-e9b6dc48b2.pdf, 09-06-2024.